হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আত্মার আলো

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ৪ জানুয়ারী ২০১৮ ॥ ২১ পৌষ ১৪২৪ ॥ ১৬ রবিউস সানি ১৪৩৮ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

আল্লাহর অলি বা বুজুর্গানেদ্বীনের ওফাত দিবস

ওরছ শরীফের বহু প্রমাণ

শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

ওরছ শরীফকে আরবীতে বলা হয় 'আরুস' আর 'শরীফ' অর্থ পবিত্র। ওরছের আভিধানিক অর্থ- 'শাদী' আর শাদী ফার্সী শব্দ। এ জন্যই বর-কনেকে আরবী ভাষায় ওরছ বলা হয় অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ বা মিলন। তাই বুযুর্গানেদ্বীনের ওফাত দিবসকে ওরছ বলা হয়ে থাকে। কারণ, বুযুর্গব্যক্তিরা ইন্তেকাল প্রাপ্ত হলে তাঁর রবের সাথে দেখা হয়, মিলন হয়। মিশকাত শরীফে কবরে আজাবের প্রমাণ শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যখন মুনকার-নাকির কবরবাসীর পরীক্ষা নেয় এবং যখন সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, তখন তাকে বলেন- আপনি সেই দুলহানীর মত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন, যে ঘুম থেকে আপনার প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না। মুনকার নাকির রাসুল (সঃ)-কে দেখিয়ে জিজ্ঞাস করবেন, ওনার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? নেককার ব্যক্তি উত্তরে বলবেন, তিনিই তো সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ দুলহা। কবরে ওইদিন রাসুল (সঃ)-এর সাথে উম্মতের সাক্ষাতের দিন, নিশ্চয়ই সে কারণে এ দিনকে ওরছের দিন বলা হয়। বাস্তবিক অর্থে পীরে কামেল মোকাম্মেল অলিআল্লাহর ওফাত দিবসে প্রতি বছর কোরআন-হাদিস মতে ইসলামী মাহফিল কোরআন তিলওয়াত ও দান সদকা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য ছওয়াব হাসিল করা ও ইন্তেকাল প্রাপ্ত ব্যক্তির রূহে ছওয়াব পৌছানোকে ওরছ বলা হয়। তাফসীরে কবীর ও তফসীরে দুর্রে মনসুরে উল্লেখ আছে– রাসুল (সঃ) প্রতি বছর শহীদদের কবরে তাশরীফ নিতেন এবং শহীদানদের সালাম দিতেন। চার খলিফাগণও অনুরূপ করতেন।

শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব ফতওয়ায়ে আযীযিয়ার ৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন– অনেক লোক একত্রিত হয়ে এবং খতমে কোরআন পড়া হয়, আর খাদ্যদ্রব্য শিরনীর ফাতিহা দিয়ে সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ ধরণের রীতি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ও খুলাফায়ে রাশদীনের যুগে ছিল না। কিন্তু কেউ যদি করে, তাতে কোন ক্ষতি নেই বরং জীবিতগণ কবরবাসীর দ্বারা লাভবান হয়। 'যুবদাতুন নসায়েহ ফি মসায়েলিয যবায়েহ' গ্রন্থে শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব (রহ.) মৌলভী আব্দুল হাকিম ছাহেব শিয়ালকোটির একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন– 'মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণেই

২-এর পাতায় দেখুন

অকূলও দরিয়ার মাঝে ডুবা তরী ভেসে রয়

আলহাজ মোঃ জয়নাল আবেদীন

দেওবন্দ মাদ্রাসার জনৈক মোহাদ্দেস সাহেব একদিন জাহাজে চড়ে হজে যাচ্ছিলেন। জাহাজটি যখন আরব সাগর অতিক্রম করছিলো এমন সময় প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে যায়। অতি চেষ্টা করেও সারেং জাহাজটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন না, তখন সারেং জাহাজে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, হাজী সাহেবগণ আল্লাহর কাছে তওবা করেন, আর আল্লাহর নিকট সবাই রোনাজারি করেন। আমরা তখন আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি শুরু করলাম এই বলে– হে মাবুদ! তুমি কি তোমার ঘর পবিত্র বায়তুল্লাহ জিয়ারত করার সুযোগ দিবা না? তোমার ঘরের মেহমানদেরকে তুমি আরব সাগরে ডুবিয়ে মারবা? এমনভাবে কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখে তন্দ্রা এসে পড়লো। মোহাদ্দেস সাহেব বললেন, এমন সময় আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, রশিদ আহাম্মেদ গাঙ্গুয়ী (রঃ) একটি নৌকায় বসে জাহাজের দিকে আসছেন। তারপর দেখলাম, জাহাজটিকে ধরিয়া রাখলেন। এমনিভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ সারেং সাহেব সবাইকে ঘোষণা দিতে শুরু করলেন– হাজী সাহেবগণ, আলহামদুলিল্লাহ!

২-এর পাতায় দেখুন

শরিয়ত ও সূফীবাদ প্রসঙ্গে ইমাম গাজ্জালীর (রঃ)এর দর্শন

আত্মার আলো ডেস্ক : কোনো সূফী সাধককেই শরিয়ত অমান্য করলে চলবে না। কেননা শরিয়ত অমান্য করলে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। আবার কেবল শরিয়ত আমল করেও সূফী হওয়া যাবে না। সূফী-সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে পীর-মুরিদ বা গুরু-শিষ্য পরম্পরা, এ সাধনার মধ্যে চরমভাবে নিষ্ঠাবান থেকে জীব তার পরমকে সন্ধান করেন। পরিপূর্ণরূপে খাঁটি মানুষ হতে গেলে অবশ্যই আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন আছে এবং সে সাধনা কোনো কামেলপীর বা সূফী-সাধকের সান্নিধ্যে গিয়ে করলে শিষ্য বা মুরিদের কামিয়াবী অর্জনের পথ সহজ হয়। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) সূফী দর্শনকে মানুষের কাছে খুব সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য নিরলস কলম চালিয়েছেন এবং তাঁর সুচিন্তার ফসল কিতাব আকারে তুলে ধরেছেন সারাবিশ্বের মানুষের সামনে। যাতে মানুষ বিস্মৃত না হন যে, আল্লাহর মনোনীত ইসলামের অন্তর্নিহিত সূফী মতাদর্শ একটি মৌলিক ও পরিচ্ছন্ন পথ বা পদ্ধতি। আর এ পদ্ধতি অনুসরণকারী হবেন সূফীসাধক, তাকে সাধনার মধ্য দিয়েই অভীষ্ট লক্ষে অর্থ্যাৎ আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্যে যেতে হবে। কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী দুনিয়ার জীবনযাপনের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-নীতিকেই শরিয়ত বলা হয়। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শরিয়ত অনুসরণ করা কর্তব্য। পারলৌকিক

২-এর পাতায় দেখুন

তরুণ প্রজন্মের কাছে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা

সেহাঙ্গল বিপ্লব আল মোজাদ্দেদি

এ বিশ্বে কোরআন শরীফ একটি স্থিতিশীল সুন্দর ও সুশৃংখল জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য ভিত্তি, যা মানুষের বিশ্বাস বা পদ্ধতি উপস্থাপন করে থাকে। জান্নাতে ফিরে যাওয়া মানেই একটি বিজয়ী প্রত্যাবর্তন, আর জাহান্নামী হওয়া মানেই জীবনকে পরাজিত করে নিঃশ্ব হয়ে কবরে যাওয়া। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি বা বিতর্ক রয়েছে অনেক। মানুষের মৌলিক সুখ হলো রাসুল (সঃ)-এর প্রতি অসীম ভালোবাসা, অস্তিত্বের ভিতর আধ্যাত্মিক সত্যতা ও আত্মার বিজয় সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক বিশ্বাস স্থাপন করা। আজ বিশ্বব্যাপী তরুণরা 'মুসলিম ও অমুসলিম' বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ দ্বারা প্রভাবিত পরিবেশে শিক্ষিত হচ্ছে। তাদের মনকে সংকুচিত করে জীবন ও কর্ম শিক্ষা সম্বন্ধে তথাকথিত ভুল তথ্য উপস্থাপনের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। ইসলামী আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান একটি স্বাগতিক উন্নয়ন হতে প্রমাণিত, আধুনিক সময়ে তরুণ প্রজন্মের কাছে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা যুক্তিসঙ্গত এবং সন্দেহ ছাড়াই প্রদর্শিত হয়। এ কথা ঠিক যে, বিজ্ঞান মানুষের জীবনের গতি সঞ্চার করেছে, কিন্তু সংবেদনশীল

৩-এর পাতায় দেখুন

নারী ও পুরুষের চুল রাখার সুন্নতী নিয়ম

হাদিস শরীফে পুরুষদের চুল রাখার তিন ধরণের নিয়মের কথা উল্লেখ আছে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) সাধারণ বাবরী চুল রাখা পছন্দ করতেন এবং তিনি নিজেও বাবরী চুল রাখতেন। তিন রকম পদ্ধতিতে চুল রাখার নিয়ম এক- উভয় কাঁধ বরাবর। দুই- ঘাড়ের মাঝামাঝি। তিন-উভয় কানের লতি পর্যন্ত (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৪১৮৩-৪১৮৭)।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) এহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডাতেন। এছাড়া তিনি কখনো মাথা মুণ্ডাননি। এ সময় তিনি মাথা মুণ্ডানোকে চুল ছোট করে রাখার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এজন্য ইমাম তাহতাবী (রহঃ) বলেন, এহরামের সময় মাথা ন্যাড়া করাও সুন্নাত। আর কিছু অংশ মুণ্ডানো ও কিছু রেখে দেওয়া নিষেধ। মুণ্ডাতে ইচ্ছে না করলে চুল

২-এর পাতায় দেখুন

চেয়ারে বসে নামাজ আদায় প্রসঙ্গে

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন– 'সুতরাং তোমরা যতটুকু সম্ভব ততটুকু আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।' আল্লাহতায়ালা আরও বলেন– 'আল্লাহ কোনো আত্মাকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না।' অনেক সময় দেখা যায় যে, মসজিদে কিংবা বাসাবাড়িতে অনেক নামাজি বা মুসল্লি চেয়ার বা টুলে বসে নামাজ আদায় করেন। তিনি হয় তো বয়সের ভারে অথবা অন্য কোনো শাররীক অসুবিধার জন্য চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করছেন, এ ক্ষেত্রে কিছু বিধানও রয়েছে, এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। আমরা জানি নামাজ ইসলামের মূল স্তম্ভের একটি, এবং নামজের সঙ্গে ব্যক্তির অন্যান্য কর্মকাণ্ড বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জড়িত। সুতরাং নামাজ যদি শুদ্ধ হয় তবে অন্য আমলও শুদ্ধ হবে। আর যদি নামাজই শুদ্ধ না হয় তবে অন্যান্য আমলও শুদ্ধ হয় না। তাই রাসুল (সঃ) বলেছেন– 'লা সালাতা ইল্লা বি-হুজুরিল কালব।' অর্থ্যাৎ হুজুরী দিলে নামাজ আদায় করা হলো প্রথম ও প্রধান শর্ত। নামাজকে যথাযথভাবে আদায় করতে সচেষ্ট থাকার বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বর্তমানে প্রায় সকল মসজিদেই একাধিক মুসুল্লিকে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করতে দেখা যায়। এমন অনেকে আছেন যে, দাঁড়াতে পারেন, কিন্তু রুকু বা সিজদা করতে পারেন না, অথচ সে না দাঁড়িয়ে বসে বসে নামাজ আদায় করছেন, অথচ সালাতের প্রতি রাকাতে দাঁড়ানো নামাজের রুকন। আমাদের এ জাতীয় আরও কিছু ভুলত্রুটি হয়ে থাকে।

প্রিয় পাঠক, এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করছি। প্রথমত: যে ব্যক্তি অসুখের কারণে কিয়াম, রুকু, কিংবা সিজদা কোনোটিই করতে সক্ষম নয় তার পক্ষে যেভাবে বসে নামাজ আদায় করা সম্ভব হয় সেভাবেই আদায় করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, যিনি চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করবেন তিনি সরাসরি ইমামের পিছনে বসা উচিৎ না, নামাজের কাতারের ডান বা বাম দিকের শেষে বসবেন। আরও নিয়ম হলো, চেয়ারটি হবে আকারে ছোট। যাতে পার্শ্বস্থ ও পিছনের অন্যান্য মুসল্লিদের কাতার নষ্ট বা সোজা করতে অসুবিধা না হয়। দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি দাঁড়ানো ও রুকু করতে সক্ষম, সিজদা করতে সক্ষম নয়। সে ব্যক্তি সাধারণ নামাজ আদায় করবে। তিনি দাঁড়ানো ও রুকু যথা নিয়মেই আদায় করবেন। যখন সিজদা করার সময় হবে তখন তিনি চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত

৩-এর পাতায় দেখুন

নামাজ হল মুমিন লোকের জন্য মেরাজ
–আল হাদিস

আমার আলো

ওরছ শরীফের বহু প্রমাণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ অপবাদ দেয়া হয়, কোন ব্যক্তিই শরিয়তের নির্ধারিত ফরজসমূহ ব্যতীত অন্য কিছুকে ফরজ মনে করে না। তবে নেক বান্দাদের কবরসমূহ থেকে বরকত লওয়া এবং ঈসালে ছাওয়াব, কোরআন তিলাওয়াত, শিরনী ও খাদ্যদ্রব্য বণ্টন দ্বারা ওদের সাহায্য করা উলামায়ে কিরামের মতে ভালো কাজ। মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও আশরাফ আলী থানভীর পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজের-এ মক্কী ছাহেব রচিত 'ফয়সালা-এ-হাফতে মাসায়েল' পুস্তিকায় ওরছ জায়েয হওয়া সম্পর্কে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং স্বীয় আমলের কথা এভাবে বর্ণনা করেন– ফকীরের বিনয় এই যে, প্রতি বছর আমি আমার পীর-মুর্শিদের পবিত্র আত্মার প্রতি ইসালে ছওয়াব করে থাকি। প্রথমে কোরআনখানি হয়, এরপর যদি সময় থাকে মিলাদ শরীফের আয়োজন করা হয় এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাবার পরিবেশন করা ও এর ছওয়াবও বখশিশ করে দেয়া হয়। মৌলভী রশীদ আহমদ ছাহেবও ওরছকে জায়েয বলেছেন। যেমন ফতওয়ায়ে রশিদিয়া প্রথম খণ্ড কিতাবুল বিদআতের ৯৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন- আরববাসী থেকে জানা যায় যে, মক্কা শরীফের লোকেরা হযরত সৈয়দ আহম্মদ বদ্দবী (রহ.)-এর ওরছ অনেক ধুমধাম সহকারে পালন করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে মদীনা মনোয়ারার আলিমগণ হযরত আমীর হামযা (রাঃ)-এর ওরছ করে থাকেন, যার পবিত্র মাযার উহুদ পাহাড়ে অবস্থিত।

দেওবন্দের পীর আশরাফ আলী থানভী সাহেব, রশিদ আহমেদ গাংগুহী সাহেব, কাশেম নানুতভী সাহেব, খলিল আহমেদ আম্বাটভী সাহেবদের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজের-এ মক্কি (রহ.)-এর কিতাব (ফায়সালা-এ হাফতে মাসায়েল) থেকে বর্ণনা তুলে ধরতেছি– তিনি লিখেন যে, মৃত্যুর পরে নেক বান্দাদেরকে বলা হবে দুলহার মত শুয়ে পরো। নেক বান্দাদের বেলায় ইন্তেকাল হল মাহবুবে হাকীকির সাথে মিলনের নাম। এ জন্যই তাদের মৃত্যুকে বেসাল বা মিলন বলা হয়। মাহবুবে হাকীকির সাথে মিলনের চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে? ওরছের নিয়ম চালু করার উদ্দেশ্য ছিল বুযুর্গানেদ্বীনের রুহের প্রতি ইসালে সওয়াব করা, যা মহান আল্লাহর খুবই পছন্দনীয় কাজ। যে সব পূর্ণবুযুর্গ থেকে আমরা ফয়েয বরকত লাভ করেছি, এ ব্যাপারে আমাদের ওপর তাদের অধিক হক রয়েছে। এবং প্রতি বছরে ওরছ শরীফে পীর ভাইদের সাথে পরস্পর মিল মুহব্বত ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায় ও ইসলামের জযবা তৈরী হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাওফুন আলাইহীম ওয়ালাহুম ইয়াহযানুন।' অর্থ- সাবধান নিশ্চয়ই আউলিয়াগণের কোন ভয় নেই, তারা কোনো কারণে কখনো দুঃখিত বা চিন্তিত হবেন না।' রাসুল (সঃ) বলেছেন– আউলিয়া আল্লাহি লাইয়ামুতুন।' অর্থ- কোন অলির কখনো কোন সময় মৃত্যু নেই।' আবার সুরা আল বাক্বারাহ: ১৫৪ আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন, অর্থ- আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।' এই আয়াতের সারমর্ম হলো আল্লাহর খাস বান্দা বা বন্ধু-অলিআল্লাহগণ সাধনায়রত অবস্থায় দারুল ফানা থেকে দারুল বাকায় অবস্থান করেন। অতএব তাঁদের মৃত মনে করা চরম অন্যায়। পবিত্র কোরআনে সুরা আল ইমরান ১৬৯ আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও রিজিকপ্রাপ্ত।' মহান আল্লাহতায়ালা সুরা আ'রাফ : ১৭৯ আয়াতে বলেন– 'আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ, তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না. জন্তুর মত তারা চতুষ্পদ; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর, তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।' এখন কথা হলো, মহান আল্লাহতায়ালা স্বয়ং যেখানে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর অলিবন্ধুরা কখনো মরেন না এবং কবরে তাঁদের জন্য রিজিক দান করেন, সেখানে তাঁদেরকে মৃত বলা আল্লাহর বাণীর বিরোধিতা করার শামিল নয় কি? আর আল্লাহর বিরোধিতাকারীর শাস্তি কেমন হবে তাও পবিত্র কোরআনে বিশদভাবে উল্লেখ আছে। তাই এসমস্ত আউলিয়াকেরামগণের ওফাত দিবসে তাঁদের স্মরণে ওরছ শরীফ বা ফাতেহাখানি ও সদকা, মান্নত করে তাবারকের ব্যবস্থা করা হয়, বিশেষ এ তাবারক গ্রহণ করে মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করছে এবং রহমত ও বরকতপ্রাপ্ত হন। পাঠকগণ, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মর্ম-মূলে কি বলা হয়েছে তা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেন তবে আপনাদেরও জ্ঞান-চক্ষু খুলে যাবে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুর বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহর রাসুল (সঃ) কবরের বর্ণনা দিতে গিয়ে মালাইকার (ফেরেশতার) মুখ দিয়ে নেককার লোকদের বলেন– 'নাম কানাওমাতিল আরুস' অর্থাৎ, তুমি বাসর রাতের বর কনের মত ঘুমাও, (তিরমিজি, মিশকাত শরীফ)।' অন্য জায়গায় আছে, ওরছ শব্দের অর্থ বাসর রাতের মিলন, ওলীমার খানা ও খুশী ইত্যাদি, (মিসবাহুল লুগাত ৫২০ পৃষ্ঠা)। যেহেতু পবিত্র কোরআন মতে একজন কামেলঅলি কখনো মৃত নয় তাঁরা মহান আল্লাহর তরফ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত হন। কারণ তাঁরা পুত:পবিত্র, তাঁদের সমাহিত স্থান আল্লাহর রহমত পাবার স্থান। সুরা আরাফ-এর আয়াত ৫৬ এ আল্লাহতায়ালা বলেন– 'পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না, তাকে আহবান কর ভয় ও আশা-সহকারে নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।' এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিশেষভাবে নবী-রাসুল ও অলিআল্লাহরাই আল্লাহর তরফ থেকে খাস করুণাপ্রাপ্ত হন সে কারণেই তাঁরা পুত:পবিত্র। তাই সময়ের আবর্তে ধর্মের ভিতরে কিছু অধর্ম ঢুকে গেলে জামানার মোজাদ্দেদ আউলিয়াগণ সেই সমাজ থেকে ধর্মের নামে অধর্ম মুছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরিতে স্বচেষ্ট হন। পাঠক এখন আপনারাই ভেবে দেখুন, স্বয়ং আল্লাহতায়ালা যাঁদেরকে এত মর্তবা দান করে তাঁদের উছিলায় সাধারণ মানুষদের নাজাতের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের কর্তব্য থেকে কেনো গাফেল হয়ে থাকবো? এটা আদবের খেলাফ নয় কি? ওরছ শরীফে আসবেন ফয়েজ, বরকত, রহমত ও নিয়ামত হাসিল করতে এবং ওরছ শরীফ থেকে প্রকৃত মুত্তাকিন কখনো খালি হাতে ফিরে যায় না। সুরা আল ফাতহা আয়াত ১০এ আল্লাহ বলেন– 'যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রহিয়াছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ দ্রুতই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।' তাই দিধামুক্ত হয়ে বলছি, এক আল্লাহর আনুগত্যশীলরাই পবিত্র ওরছে এন্তেজাম করে থাকেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত– নবী করিম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুর্শিদের থেকে এমন কিছু দেখতে পায় যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে কেননা. যে ব্যক্তি এক বিঘাত পরিমান জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করলো সে জাহেলিয়াত যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করলো।'

ওরছ শরীফের সাজ-সজ্জা

সৌন্দর্য বিষয়ে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারা ১৩৮ আয়াতে বলেন– 'ছিবগাতাল্লাহি ওমান আহ্ছানু মিনাল্লাহি ছিবগাহ।' অর্থ- আল্লাহর রঙে রঙিন হও, আল্লাহর চেয়ে উত্তম রঙ আর কার আছে।' আল্লাহর সৌন্দর্য এবং পছন্দের ব্যাপারে হাদিস শরীফে রাসুল (সঃ) বলেন– 'ইন্নাল্লাহা জামিল ওয়া ইউহিব্বুল জামাল।' অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।' এখন আপনারাই বলেন, আল্লাহর বাণীর গুরুত্ব বেশি? না সৌন্দর্য বৃদ্ধির বিপরীতে গোমরাহী লোকদের গুরুত্ব বেশি? কিন্তু ইদানিংকালে যারা ওরছ শরীফের বিরোধিতা করেন, সাজসজ্জার বিরোধিতা করেন তাদের জানা ও বোঝার জন্য বলছি, মহান আল্লাহতায়ালা কত সুন্দর করে অধিক মমতা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্ব প্রকৃতি তাকিয়ে দেখুন, যেদিকে তাকাবেন দুচোখ জুড়িয়ে যাবে তবু দেখার স্বাদ মিটবে না। আর এ অপরূপ সৃষ্টির সুমহান স্রষ্টা যিনি তিনি কতটা সুন্দর হতে পারেন, তা সাধারণের চিন্তারও বাইরে! তাই তারা ওরছ শরীফকে ঘিরে আলোকসজ্জা বা ঝাঁকঝমকপূর্ণ সাজ-সজ্জার বিরোধিতা করে থাকেন। এমন করবেন না এতে আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর অলিবন্ধুরা বেজার হন, না খোশ হন। আমরা সাধারণত কোন অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করলে সেখানে সাজ-সজ্জা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করি। আর যেখানে কোরআন-হাদিস ও অলিআউলিয়াগণের শানমান আলোচনা করা হয়, সে স্থানের পরিবেশে সুন্দর আলোকসজ্জা করলে আপনাদের কেনো ভালো লাগে না? হয়তো ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে। এ সমস্ত গোমরাহী পথ ও মত পরিহার করে কামেল পীরের হাতে বাইয়াত নিয়ে পরিশুদ্ধ মানুষ হওয়ার জন্য চেষ্টা তদবির করুন, তবেই মহান আল্লাহতায়ালা সবাইকে হেদায়েদ দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

নারী ও পুরুষের চুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছোট রাখা যেতে পারে।' আলেমগণ তিন পদ্ধতিতে বাবরী রাখাকে সুন্নাত আর মাথার চুল ছোট করে রাখা ও এহরামের সময় মাথা মুণ্ডানোকে জায়েজ বলেন। এ তিনপ্রকার চুল রাখার পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে যেমন, লিম্মা, জিম্মা এবং ওফরা। এছাড়া সামনে বা পেছনে লম্বা রাখা অথবা ডানপাশে বা বামপাশে ছোট-বড় করে চুল রাখাকে জায়েজ মনে করেন না। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, চুলের কাটিং ভিন্ন কোন জাতিসত্তার অনুকরণে হলে, তা-ই নাজায়েজের মধ্যে শামিল হবে, (মাহমুদিয়া ২৭/৪৬০, মিশকাত- ৩৮১, ২৩২, ৩৮০)।

> অবশ্য না কাটলেও কোনো সমস্যা নেই। (তিরমিজি শরীফ ১/১৮২, মুসলিম শরীফ ১/১৪৮)। কিন্তু ইদানিং কালে অনেক মা-বোনকেই দেখা যায়

তা ছাড়া কিছু লোক আছেন যারা মাথার চুল একেবারে ছোট ছোট করে ছেঁটে চামড়ার সঙ্গে মিশিয়ে রাখেন, এ ধরণের চুলধারীকে মোনাফেক বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই এ কথা সবার জানা দরকার যে, আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করলে সবরকম অপরাধীর গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন, শুধু মোনাফেকের গুনাহ মাফ করবেন না। কারণ, মহান আল্লাহতায়ালা বলেছেন– 'মোনাফেক, আমি আল্লাহর শত্রু।' আমরা কি চাই কেউ আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত হই? নিশ্চয়ই তা চাই না।

মহিলাদের চুল রাখার নিয়ম

ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী মেয়েদের ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কেটে ছেলেদের মতো করে রাখা সম্পুর্ণ নিষেধ। আবার অনেক বড় রাখাও উচিত নয় কারণ, গোছলের সময় পানি সে চুলের সবখানে পৌঁছানোও কষ্টকর হয়। বরং পিঠ বা কোমর পর্যন্ত রাখাই উত্তম। সে মতে কোমরের নিচের অংশ কেটে ফেলা জায়েজ আছে। অবশ্য না কাটলেও কোনো সমস্যা নেই। (তিরমিজি শরীফ ১/১৮২, মুসলিম শরীফ ১/১৪৮)। কিন্তু ইদানিং কালে অনেক মা-বোনকেই দেখা যায়, তারা মাথার চুল কেটে বিভিন্ন সাইজে রাখেন, যেমন বয়কাট ও ববকাট আপাত দৃষ্টে তাদের কাছে এটা ফ্যাশন হলেও বস্তুত পক্ষে ইসলাম ধর্মের অনুশাসনের দিক দিয়ে এটা অবশ্যই নাজায়েজ। মুসলমান হিসাবে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নতকে পালন করাই আমাদের আসল কাজ। আমরা যদি ভিন্ন ধর্মের লোকদের অনুসরণ করি তবে রাসুল (সঃ)-এর উম্মত বলে দাবী করা আমাদের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।

অকূলও দরিয়ার মাঝে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আল্লাহপাকের দরবারে আপনারা সবাই শুকরিয়া আদায় করেন। মালিক আমাদেরকে তুফানের কবল থেকে মুক্ত করেছেন। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেলো। শুনতে পেলাম সারেং সাহেব বলতেছেন, হাজী সাহেব, এই জাহাজটি এখান থেকে চল্লিশ মাইল গভীর সমুদ্রে ছিলো। আমি নিজেও বলতে পারছি না কী করে জাহাজটি চল্লিশ মাইল গভীর সমুদ্র থেকে মুহূর্তেই উপকূলে চলে আসলো! তারপর মোহাদ্দেস সাহেব তার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন যে, আমার পীর রশিদ আহাম্মেদ গাঙ্গুয়ী (রঃ) জাহাজটি গভীর সমুদ্র থেকে এখানে এনে রেখে গিয়াছেন।

ভাই-বন্ধুগণ, আল্লাহপাক সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর অলিবন্ধুদেরকে এই অলৌকিক ক্ষতার অধিকারী করেছেন। এবং আল্লাহ তাদেরকে বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত থেকে মানুষদের বাঁচিয়ে আনার ক্ষমতা দিয়েছেন। এ কারণেই মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বলেছেন– 'অকূলও দরিয়ার মাঝে ডুবা তরী ভেসে রয়।' অতএব জাহাজটি রক্ষা করেছেন মহান আল্লাহতায়ালা, কিন্তু এখানে ওই হাজী সাহেবের পীর হযরত রশিদ আহাম্মেদ গাঙ্গুয়ী (রঃ) ছিলেন প্রকাশ্য উছিলা। বিনা উছিলায় গাছের একটি পাতাও নড়ে না। তাই, দুনিয়াতে যার যার আপন পীর হলেন সমস্ত রহমত, বরকত ও নাজাতের একমাত্র উছিলা। তাই বলি ভাই-বোন, সময় থাকতে ধরো মুর্শিদের কদম। যদি করো গুরু ভজন, তবে হবে সবার আপন। যদি করো মানবসেবা, তখন হবে সবার সেরা।

শরিয়ত ও সূফীবাদ প্রসঙ্গে ইমাম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জীবনকে আরো সুন্দর করার জন্য, ইহলৌকিক জীবনেই আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে জীবনকে উন্নিত করতে হয়, এ কারণেই সূফীবাদ নামক মরমী এক জীবনাদর্শের আবির্ভাব ঘটেছে, যা একদিকে তাত্ত্বিক আর অন্যদিকে ব্যবহারিক অনুশীলনীয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময় থেকেই সূফী মতবাদের উৎপত্তি এবং ধীরে ধীরে তা সারাবিশ্বে উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু একপর্যায়ে এই মতবাদ বিভিন্ন আত্মবিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এ অবস্থা থেকে সূফীবাদকে উত্তরণের মাধ্যমে শরিয়তের সঙ্গে তার সুন্দর সমন্বয় সাধনের জন্য সচেষ্ট হন। তবুও সেই আত্মবিরোধীরা এখনো কোথাও না কোথাও বিরোধ সৃষ্টিতে লিপ্ত রয়েছে, তবে তারা কখনোই সফল হতে পারবে না, কারণ সূফীবাদের ওপর রাসুল (সঃ)-এর অর্ন্তদৃষ্টি সদা জাগ্রত। ঢাকার ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর কেবলাজানের সূফীবাদী আদর্শের মধ্যেও রয়েছে পরিপূর্ণ শরিয়ত ও পরিপূর্ণ ফারেফত। কেবলাজানের অমূল্য বাণীতে আমরা পাই, তিনি বলেন– 'ইসলাম শুধু শরিয়ত নয়। শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত এ চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে হলো পরিপূর্ণ ইসলাম।' অন্তত শরিয়তের মৌলিক বিষয়গুলো সূফীতত্ত্ব অস্বীকার করে না, বরং কামেলপীর বা সূফী-সাধকগণ শরিয়তের ওপর জোর তাগিদ দিয়ে থাকেন। কিন্তু সূফীতত্ত্বের কিছু কিছু অপব্যাখ্যাকারী এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন শরিয়তের সঙ্গে সূফীবাদের ব্যাপক বিরোধ। এ কারণে সূফীবাদ বলতেই সাধারণ মানুষ ইসলাম থেকে ভিন্ন মতাদর্শ ভাবতে শুরু করে। তবে কিছু কিছু 'সূফী' নামধারী এ মতাদর্শের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে আসছিলো, ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এ অবস্থা দেখে ব্যথিত হন। তিনি এর সংস্কার করা বড় দায়িত্ব মনে করলেন এবং সূফীতত্ত্বের সংস্কার সাধন করে শরিয়তের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে প্রয়াস নেন। বিভিন্ন সূফীসাধক ও ধর্মতত্ত্ববিদ আল্লাহর সঙ্গে গভীর প্রেমের বন্ধন গড়ে তুলতে ও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সত্তায় বিলীন হওয়ার জন্য বিভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি করেন, এই পথ বা পদ্ধতিই হলো তরিকা। সূফীতত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে ইমাম আল-গাজ্জালী (রহ.) দেখান যে, সূফীবাদ ও ইসলামী শরিয়তের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং একটি আরেকটির সহায়ক। সূফীবাদের মধ্যে কিছু তাত্ত্বিকতা রয়েছে– যা নিঃসন্দেহে দার্শনিক আলোচনার বিষয়বস্তু। সেখানে ব্যক্তিগত আবেগ, যুক্তি ও অভিরুচি আরোপ করা যেতে পারে, কিন্তু এই আত্মিকতা ও ব্যক্তিগত অভিরুচি এমন পর্যায় পর্যন্ত যাওয়া সঙ্গত নয়, যেখানে শরিয়তের সঙ্গে সূফীতত্ত্বের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাজ্জালী (রহ.) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কোনো সূফীতাত্ত্বিকের শরিয়তবিরোধী বা শরিয়তের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব বা তরিকা প্রদান করা সঙ্গত নয়। তিনি আরো বলেন, শরিয়তের মূল শিক্ষাকে অক্ষুণ্ন রেখে যেকোনো তত্ত্ব বা ব্যবহারিক মতাদর্শ প্রদান করা যেতে পারে। তার জন্য চাই অতিরিক্ত সাধনা; আর এই সাধনার জন্য থাকতে হবে সুনির্দিষ্ট সাধনা-পদ্ধতি। এই সাধনা-পদ্ধতি হলো সূফীতত্ত্ব। একজন সূফীর জীবনে শরিয়ত হলো প্রাথমিক এবং আবশ্যিক ধাপ বা স্তর।

জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে আল্লাহর সান্নিধ্য যদি কেউ লাভ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই শরিয়তের সঙ্গে সূফী সাধনায় রত হতে হবে বলেও ইমাম গাজ্জালী (রহ.) মত প্রকাশ করেন। ইমাম গাজ্জালী কোরআন ও হাদিসের যুক্তি দিয়ে দেখান যে, কেবল শরিয়তের নিয়মে বাহ্যিকভাবে ইবাদত-বন্দেগী করলেই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায় না। এ জন্য ইবাদতের অভ্যন্তরীণ দিকের প্রতি কঠোর নজর দিতে হবে। তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় ইবাদতের অভ্যন্তরীণ দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আর এভাবেই তিনি তাঁর সমসাময়িক বিভিন্ন প্রকার সূফীতত্ত্ব ও শরিয়তের মধ্যকার আপাতবিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেন। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) শরিয়তের সঙ্গে সূফীতত্ত্বগুলোর সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রেখেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। বস্তুত তাঁর এই প্রয়াস শুধু শরিয়ত বা সূফীতত্ত্বকেই নয়, সার্বিকভাবে ইসলামকেই উপকৃত করেছেন। এ জন্য তাঁকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বলেও অভিহিত করা হয়। তাই আসুন, কামেল পীর-মুর্শিদ ও সূফীবাদের প্রতি সমালোচনা, হিংসা ও ভীতি দূর করে আল্লাহতায়ালার প্রিয় খাঁটি বান্দা ও রাসুল (সঃ)-এর আদর্শবান উম্মত হতে কামেল পীরের খাস সান্নিধ্য লাভ করি।

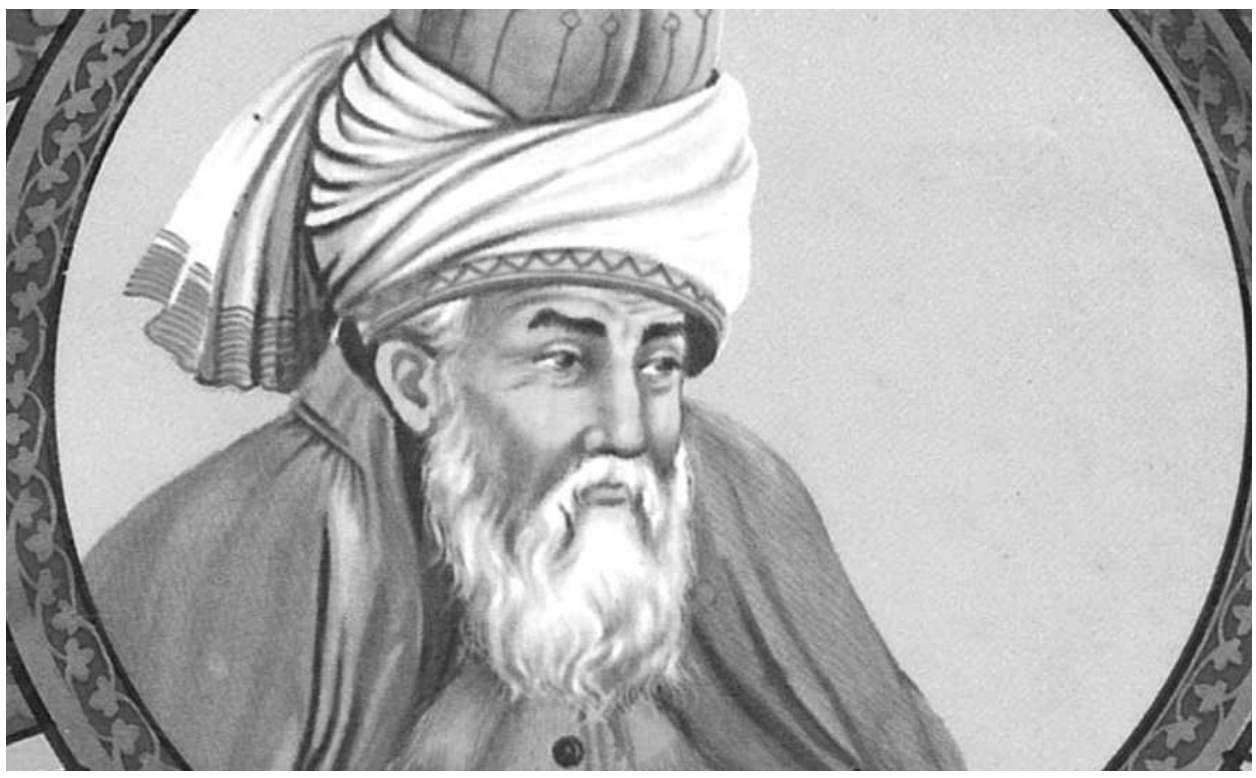

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রহ.)

কুতুববাগে মোহাম্মদী ফুল

জোবায়েদ সুমন

কুতুববাগে ফুটেছে এক ফুল
সৌরভে যার হৃদয়ও আকুল
আশেক-মুরিদ ভক্ত পাগল
তাঁর প্রেমেতে হয় আকুল
মোহাম্মদী ফুল কুতুববাগী
মোহাম্মদী ফুল ॥
সেই ফুলেরই এমন বরণ
চিত্ত তোমার করবে হরণ
চিনিয়ে দেবে নবীর চরণ
মাঝ দরিয়ায় পাবে কূল ॥
খোদার প্রিয় অলি তিনি–
তাকে কুতুববাগী নামে চিনি
সূফীবাদের পথে যিনি–
ডাক দিয়েছেন মানবকূল ॥
ফুলে ফুলে জগৎ জোড়া
সব ফুলে যে হয় না তোড়া
তিনি, আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা
চিনতে করিওনা ভুল ॥

শেষ পৃষ্ঠার পর

এবং আমাদের চেতন সত্তার অস্তিত্বের জীবন্ত বারুদ
তোমার স্পর্শেই বিকশিত হয় আদিগন্ত মনোভূমি
বিস্ফোরণের মতোই তোমার নামের কল্যাণী দরূদ
আমাদের ঘুমন্ত নদীগুলোকে করে তোলে স্ফীত।
তোমার অস্তিত্ব লুকোনো রয়েছে অতি সুকৌশলে
তোমার তাবৎ উপহার প্রকাশ্য এবং অবারিত।
আমরা তো কেবল তৃষ্ণার্ত পাথর সমুদ্রতটে দলে দলে
তুমিই রহমতের জলধারা, ভেজাও নিয়ত আমাদের
তুমি প্রবহমান বাতাস, আমরা তো ধূলিকণামাত্র
সকলেই দেখে নড়াচড়া, ওড়াওড়ি, ধুলিঝড়ের
অদেখা বায়ুর মতো প্রবাহিত তুমি অহোরাত্রি।
তুমিই অদৃশ্য বসন্তের বায়ু, আমি দিগন্তের সবুজ বনানী
তুমি অন্তর্নিহিত শক্তি, আমি তো কেবল অসার হাত ও পা
তুমি উপস্থিত বলেই নড়ে ওঠে আমাদের হস্ত-পদখানি

সূফীবাদ-আধ্যাত্মিকতা ও

আমি তো শুধুই কণ্ঠস্বর, তোমার জ্ঞানই অস্তিত্বে রোপা
আমাদের এই হাঁটাচলা বিশ্বাসেরই নিরন্তর প্রতিভূ
অনন্ত স্বাক্ষর সন্দেহাতীত তোমার অমোঘ অস্তিত্বের
আমি তো কেবলই এক প্রায়ান্ধ প্রদীপ, নিভু-নিভু
তোমার স্পর্শেই জ্বলে উঠি নিয়ত, ঘোষণা করি বিজয়ের।
মাথার ওপর অহরহ বাসা বাঁধে সময়ের ধূলিকণা
মেঘের জেলাবী খুলে আকাশ দেখায় কী নিখুঁত তার পেট
তোমার এ দাস কি করে লিখবে বলো গুণের বর্ণনা?
আমার এ আত্মা হোক তোমার পায়ের নিচে বিছানো কার্পেট।

সুধী পাঠক, ইসলামের আধ্যাত্মবাদ যুগে যুগে দেশে দেশে বিপুলভাবে চর্চা হয়ে আসছে, এ ভাব ধারা নতুন নয়। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের মুসলিম দেশগুলোতে সূফীবাদের চর্চা ও প্রসার ইশ্বর্ণীয় পর্যায়ে থাকলেও, উপমহাদেশে এর অগ্রযাত্র তুলনামূলক শিথিল। একটা সময় এ দেশেও সূফীবাদের প্রতি সকল মানুষের শ্রদ্ধা ও আগ্রহের কমতি ছিলো না, কিন্তু পুঁজিবাদের আগ্রাসনে কিছু বিতর্কীপন্থির কুশিক্ষা ও ধর্মান্ধতার কবলে পড়ে, মহান আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর সত্য পথের সন্ধান থেকে, সাধারণ মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুনাফা লুটেছে। সূফীবাদ মানুষে মানুষে শ্রেণি বৈষম্য বিশ্বাস করে না, অথচ পুঁজিবাদী ওই গোষ্ঠী বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে আধ্যাত্মবাদের চেতনাকে তীব্র সমালোচনায় লিপ্ত রয়েছে। সূফীবাদের তথা আধ্যাত্মবাদের মহা জ্ঞানী হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রঃ)-এর কবিতায় দেখতে পেলাম, কামেল পীর-মুর্শিদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মেলবন্ধন, যা বর্তমান সময়ে প্রত্যেক মানুষের জন্যই জানা ও মেনে চলা জরুরী।

গ্রন্থনা : সেহাঙ্গল বিপ্লব আল মোজাদ্দেদি

তরুণ প্রজন্মের কাছে বিজ্ঞান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মানুষের থেকে আবেগ ও অনুভূতি কেড়ে নিয়েছে। আর তাই সারাবিশ্বে শুধুমাত্র আবেগের অভাবে মানুষ কঠিন ও যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। মায়া-মমতা, বিশ্বাস-ভক্তি ও শ্রদ্ধা হারিয়ে যেতে বসেছে। এক কথায় বিজ্ঞান রোবটের মত যন্ত্রদানবের পাশাপাশি মানুষকেও যন্ত্রমানবে রূপান্তর করে ফেলছে! আধুনিকতার নামে যে উপস্থপনা আমাদের সামনে করা হচ্ছে তা, সাময়িক অর্থে কাজের হলেও এর দ্বারা আত্মিক বা পারলৌকিক কোনো উন্নতি আশা করা যায় না। আত্মিক উন্নতির জন্য চাই আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মৌলিক শিক্ষাদীক্ষা। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বিজ্ঞানের জৌলুসে গা ভাসিয়ে ভুলে থাকে ধর্মের মৌলিকত্ব। আধুনিক শিক্ষিত লোকের মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে অনেকে মনে করেন This is a prehistoric education system And spirituality leas are nothing. আসলে তারা অন্ধের স্বর্গে বাস করেন। বিখ্যাত গ্রন্থ গ্যাব্রিয়েল উইং এর লেখক ও ভারত-মুসলিম সংস্কৃতি বিষয়ক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অ্যানিমি শিম্মেল। তিনি 'ক্লাসিক্যাল মিস্টিসিজম' ঐশ্বরিক প্রেমের উপাদান প্রবর্তন, যা রহস্যবাদে সন্ন্যাসীতা পরিবর্তন করে বলেন– 'রাবিয়া (৮০১ খ্রিস্টাব্দে), বসরা থেকে একজন মহিলা যিনি আল্লাহর (ঈশ্বর) সূফী আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা ছিল নিঃশর্ত। রাবিয়ার পর কয়েক দশক ধরে ইসলামিক জগতে রহস্যময় প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে যায়, আংশিকভাবে খৃস্টান উৎস সৃষ্টির সঙ্গে চিন্তাভাবনার বিনিময়ে। প্রজন্মের বেশ কয়েকজন মুশরিক তাওয়াক্কুলের ওপর তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিল, ঈশ্বরের (আল্লাহ) ওপর পরম নির্ভরতা, যা সূফীবাদের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা হয়ে ওঠে। এ সময় একটি ইরাকী স্কুল তার কঠোর স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মানসিক অর্ন্তদৃষ্টির জন্য সুপরিচিত হয়ে ওঠে। ইরাকী স্কুলটি আল-মুসাবি (৮৫৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন) দ্বারা শুরু হয়েছিল– যারা বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বরের সঙ্গে ভাব সঙ্গীতের মাধ্যমে আত্মাকে শুদ্ধ করা যায়। বাগদাদের জুনায়েদ (মৃত্যু ৯১০ খৃস্টাব্দ) মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর শাস্ত্রীয় জ্ঞানী ও প্রজ্ঞার শিক্ষাগুলো রেখে গেছেন, যা পরবর্তীতে সংশোধন ও বৈধতার সংক্রমণের চেইনগুলো ফিরে যায়। সূফীবাদের একটি মিশরীয় স্কুলে, নুবীয়ান ধূ আল-নুন (৮৫৯ মৃত্যুবরণ খৃস্টাব্দ) ঐতিহাসিকভাবে টিকটিক্যাল শব্দ মঈফাই (অভ্যন্তরীণ জ্ঞান) চালু করেছিলেন, যা প্রচলিত শিক্ষার বিপরীতে ছিল; তাঁর স্নেহপূর্ণ প্রার্থনা, তিনি পবিত্র কোরআনের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর প্রশংসা-প্রণয়নে সমস্ত প্রকৃতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এবং পরবর্তীতে ফার্সি ও তুর্কি কবিতায় প্রসারিত করেছিলেন। ইরানী স্কুলে, আবু ইয়াসীদ আল-বিসামামি (৮৭৪ মৃত্যুবরণ খৃস্টাব্দ) সাধারণত আত্মবিস্মৃতির প্রাণনাশের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়; তার উচ্চারণের অদ্ভুত প্রতীকটি পরবর্তীতে রহস্যময় কবিদের পরিভাষায় অংশ নেয়। একই সময়ে ঐশ্বরিক প্রেমের ধারণা আরও কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে, বিশেষ করে ইরাকী সূফীদের মধ্যে। এর প্রধান প্রতিনিধি নূরী, যিনি তাঁর ভাইদের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন।'

প্রিয় পাঠক এসবের দ্বারা বোঝা যায়, আধ্যাত্মিকতা ছাড়া বিজ্ঞানের যাত্রা সুখকর নয়। এবং এ ক্ষেত্রে সূফীদের সাধনা ও বিজ্ঞানের গবেষণা উভয়ের উদ্দেশ্য আলাদা আলাদা, সূফীদের অধ্যাত্মবাদের সাধনা হলো আল্লাহকে পাওয়ার অর্থাৎ স্রষ্টাকে সন্ধান করে তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করা। এবং বিজ্ঞানের গবেষণা হলো টেকনোলজির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আবার অনেক বিজ্ঞানী তাদের গবেষণায় পেয়েছেন, ইসলামী আধ্যাত্মবাদ একটি মৌলিক যোগ, এ যোগের মাধ্যমে একই সঙ্গে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা সম্ভব। রাসুল (সঃ)-এর বিভিন্ন দিক-নির্দেশনাকে (বাণী) বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যেমন, নামাজ একটি অত্যাধুনিক ব্যায়াম, অজু শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য পরিচ্ছন্ন একটি পানি-মিস্ত্রিত মালিশ, যে মালিশ মনকে পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল রাখে। পায়ের টাকনুর উপরে কাপড় পরা সুন্নত। এর কারণ কী এ বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জেনেছেন, পায়ের টাকনুর ভিতরে এমন এক ধরণের তরল পদার্থ থাকে, যে পদার্থ বাহিরের আলো ও তাপ শোষণ করে এবং তা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। যদি কেউ দীর্ঘদিন পায়ের টাকনু ঢেকে রাখে, তবে সে তার স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। এমনকি ধীরে ধীরে তার পা চিকন হতে থাকে। এমন অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যা রাসুল (সঃ) উম্মতের জন্য রেখেছেন। তাই, এ বিষয়গুলো জানাজানি হওয়ার পরেই দেখা গেছে অনেক তরুণসহ মুরুব্বিরাও পায়ের টাকনু উন্মুক্ত রেখেই কাপড় পরে। আর এ কথা খুব নির্দিধায় বলা যায়, আধুনিক বিশ্বে যা কিছু আবিষ্কার তার সবটাই পবিত্র কোরআনের ইঙ্গিত থেকে নেওয়া। বিজ্ঞানীরা মানুষের জীবন যাত্রাকে দ্রুতগামী করে তুলতে সাহায্য করেছেন তাই তাদের অবদানকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু ইসলামী সূফীবাদের আধ্যাত্মিক সাধকগণ আল্লাহতায়ালা ও রাসুল (সঃ)-এর মহব্বতকে মানুষের অন্তরে অন্তরে প্রসারিত করেছেন। বিজ্ঞানের একটি আবিষ্কারের চেয়ে মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করা কঠিন ও দুরহ কাজ। আর সে কাজই করে থাকেন কামেল পীর-মুর্শিদগণ। মৃত্যুর সময় বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারই সঙ্গে যাবে না, সঙ্গে যাবে মহান আল্লাহতায়ালা ও রাসুল (সঃ)-এর প্রতি দৃঢ় ঈমান।

টেকনোলজির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আবার অনেক বিজ্ঞানী তাদের গবেষণায় পেয়েছেন, ইসলামী আধ্যাত্মবাদ একটি মৌলিক যোগ, এ যোগের মাধ্যমে একই সঙ্গে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা সম্ভব। রাসুল (সঃ)-এর বিভিন্ন দিক-নির্দেশনাকে (বাণী) বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যেমন, নামাজ একটি অত্যাধুনিক ব্যায়াম, অজু শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য পরিচ্ছন্ন একটি পানিমিস্ত্রিত মালিশ, যে মালিশ মনকে পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল রাখে

চেয়ারে বসে নামাজ আদায় প্রসঙ্গে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিজদার জন্য মাথা নোয়াবে। অর্থাৎ রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকে সিজদা করবেন। তৃতীয়ত: যে ব্যক্তি দাঁড়াতে পারেন রুকু ও সিজদা করতে সক্ষম নয়। তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে শুরু করবে। সে যথা নিয়মে কিয়াম করার পর যখন রুকু ও সিজদা করার সময় হবে, তখন চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত রুকু ও সিজদা আদায় করবেন। অর্থাৎ ঝুঁকে রুকু আদায় করবেন সিজদাতে রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকবেন। চতুর্থত: যিনি দাঁড়াতে সমর্থ নয়, রুকু ও সিজদা করতে সক্ষম তাহলে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করবেন। মনে রাখতে হবে, নামাজে প্রয়োজনের বাইরে চেয়ার নেওয়া যাবে না। প্রয়োজনকে তার গণ্ডির ভিতরেই রাখতে হবে। মুসল্লিদের জানা উচিত যে, এগুলো হচ্ছে ফরজ নামাজের বিধান। যদি নফল নামাজ হয় তবে সেটা পুরোটাই বসে পড়ার বিধান রয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি বসে নামাজ আদায় করবে, সে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা ব্যক্তির অর্ধেক নামাজ প্রাপ্ত হবে।' এ হাদিসটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যার ওজর নেই। পক্ষান্তরে যার ওজর রয়েছে তিনি বসে পড়লেও পূর্ণ সওয়াব প্রাপ্ত হবেন। [সর্ব বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন] ষষ্ঠত: যিনি নামাজের সকল রুকনই যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম। তবে তিনি তাশাহুদে বসতে অক্ষম। এমতাবস্থায় তিনি সাধারণভাবেই নামাজ আদায় করতে থাকবেন। অতঃপর যখন তাশাহুদের বসা আসবে তখন চেয়ারে বসে পড়বে। সপ্তমত: প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, তারা মাটিতে বসে নামাজ আদায় করবে। যদি চেয়ারে বসে আদায় করা হয় তবে তাও জায়েজ। চেয়ারের অবস্থান ও এ সংক্রান্ত বিধি- বিধান (১) মুসল্লি যদি কাতারের মাঝখানে হয় তবে চেয়ারের পিছনের পা দু'টিকে কাতারের মধ্যে রাখতে হবে। এমতাবস্থায় নিজের শরীর নিয়ে কাতার থেকে সামনে এগিয়ে বসবে। যাতে করে পিছনের কাতার নষ্ট না হয়। (২) আর যদি চেয়ার কাতারের এক পাশে কিংবা কাতারসমূহের পিছনে থাকে, আর তার পিছনে কোনো কাতার না থাকে, তবে সে চেয়ারের সামনের পা দু'টি কাতারের মধ্যে রাখবে। আর শরীর নিয়ে কাতারে থাকবেন, শরীর নিয়ে কাতারের সামনে এগিয়ে যাবেন না। এছাড়া যারা চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করবেন তাদের উচিত হবে, চেয়ারে বসার আগে সেটা ঠিক আছে কি না যাচাই করে নেওয়া। কারণ, এ সকল চেয়ার অনেক দিন ধরে মসজিদে থাকার দরুণ সেগুলো অকেজো হয়ে পড়ে। যদি কেউ নিজের মালিকানায় কোনো চেয়ার খরিদ করে মসজিদে রাখেন, তবে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারও উচিত হবে না সেটায় হস্তক্ষেপ করা। নামাজের সময় মন-দিল এক করে হুজুরীদিলে নামাজ আদায় করাই প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। সুস্থ-সবল লোকের উচিত এ ধরণের অসুস্থ মুসল্লিদের ব্যাপারে যত্নশীল ও সেবা পরায়ন মনোভাব বজায় রাখা।

মাসিক আত্মার আলো ডেস্ক :

সূফীবাদ-আধ্যাত্মিকতা ও মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রহ.)

বিশ্বজনীন ভালোবাসায় সিক্ত ফার্সী ভাষার মহামূল্য গ্রন্থ মসনবী শরীফের লেখক ও আধ্যাত্মিকতার মহান সাধক, বিশ্বসাহিত্যের প্রভাবশালী কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী, তাঁর জন্ম ১২০৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বলখ নগরের স্বনামধন্য পণ্ডিত বাহাউদ্দীন ওয়ালীদের ঘরে। শৈশব থেকেই রুমীর মধ্যে অনন্যতা প্রকাশ পেতে থাকে। ছোটবেলায় তিনি ইরানের নিশাপুরে বরেণ্য সূফী-সাধক হযরত ফরিদউদ্দীন আত্তারের সাক্ষাৎ ও আর্শীবাদপ্রাপ্ত হন। হযরত আত্তার তাঁকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে– 'এই বালকটি মানুষের অন্তরে ভালোবাসার দ্বার উন্মোচন করবে।' জ্ঞান তাপস রুমী (রঃ) তরুণ বয়সেই নিজেকে জানার মধ্য দিয়ে আত্ম-আবিষ্কারের সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন। এ জন্যে তাঁকে স্রষ্টার সান্নিধ্য প্রত্যাশী কবি বলেও আখ্যায়িত করা হয়। স্রষ্টা প্রেমের বিরহ তাঁর লেখায় রূপকার্থে ফুটে উঠেছে বারবার। রুমীর স্বর্ণালী অধ্যায় রচিত হয় ১২৪৪ সালে তাঁর পীর হযরত শামস্ তিবরিজীর সান্নিধ্য প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে, তখন তিনি পারস্যের খ্যাতিমান আলেম-পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত এবং পারস্যরাজ দরবারেও তাঁর সম্মান উঁচুতে। এমনই এক সময় হযরত শামস্ তিবরিজীর সঙ্গে মাওলানা রুমীর দেখা হয়। কিন্তু তখনও রুমীর মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কিছুই ছিলো না। এ অবস্থায় আল্লাহর ফকির হযরত শামস্ তিবরিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে আসেন, এবং এ সময়ে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও আত্মার উন্নয়নে বিশাল এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটান। যে পরিবর্তন ও আত্মিক জ্ঞানোপলব্ধি তাঁর সারাজীবনের শরিয়তি শিক্ষার মধ্যে ছিটাফোটাও পাননি। পরবর্তীতে তাঁর রচিত 'হৃদয়ের আয়নায়' ও 'দিওয়ানে শামস তিবরিজ' কাব্যগ্রন্থে পীরভক্তি, আত্মসমর্পণ, আপন মুর্শিদের প্রতি ফানা এসব রূপকের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্তরের বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেছেন। মাওলানা রুমীর দর্শনে আমিত্বকে জয় করার ধারণা ও প্রমাণ নানাভাবে ফুটে উঠেছে এভাবে, তিনি বলেন– মানুষের নফস বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিজেকে কামেল মুর্শিদের কদমে সমর্পণ করতে হবে। এবং তবেই হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হয়ে পরম স্রষ্টার সান্নিধ্য উপলব্ধি ঘটে। আল্লাহতায়ালার ফকির হযরত শাম্স তিবরিজীর প্রেমে ফানা হয়ে, সাধক-কবির হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করেছেন বিভিন্ন কাব্যিক ছন্দের গতিময়তায়। সেখান থেকেই মূল ফার্সী ভাষায় রচিত কবিতার বাংলা অনুবাদ মাসিক আত্মার আলো-এর পাঠক ভাইবোনদের জন্য তুলে ধরা হলো।

তুমিই আনন্দ

হে আল্লাহ, আমাদের কলুষিত চক্ষুগোলকের দৃষ্টি
ঝাপসা, প্রায়ান্ধ; স্ফীত আমাদের মোহান্ধ পাপের বোঝা
পূর্ব থেকে পশ্চিম অবধি ছড়ানো তোমার যতো সৃষ্টি
সবখানেই লুকিয়ে তুমি, আমাদের শুধু নিরন্তর খোঁজা।
সূর্যালোকের চেয়েও অধিক প্রোজ্জ্বল, জ্বলে আছো তুমি

৩-এর পাতায় দেখুন

কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা
আগামী ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার।
২ দিনব্যাপী পবিত্র কোরআন হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের দ্বারা দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামগণ শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের ওপর মহামূল্যাবন আলোচনা করবেন।
স্থানঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানাধিন, কুতুববাগ দরবার শরীফ।
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ আপনারা দলে দলে শামিল হয়ে দুজাহানের অশেষ ফয়েজ, বরকত, রহমত ও নিয়ামত হাসিল করুন। পর্দার সাথে মহিলাদের ওয়াজ শোনার ব্যবস্থা আছে। ওরছ শরীফে আগত সকলের জন্য বিনামূলে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বি.দ্র. শীতবস্ত্র সঙ্গে আনবেন।

সিঙ্গেল ডিজিটে সোনালী ব্যাংক
নিজের পছন্দের নির্মাণ শৈলীতে নির্মিত বাড়ীর মালিক হওয়ার সুযোগ দিতে এলো দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

আপনার স্বপ্ন পূরণ আমাদের লক্ষ্য
- মাত্র ৯ শতাংশ সুদ ভিত্তিক সাধারণ গৃহনির্মাণ ঋণ কর্মসূচির আওতায় দেড় বছর গ্রেস পিরিওড সহ সর্বোচ্চ ২০ বছর মেয়াদী এই ঋণ গ্রহণে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ কiæন।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী, দেশের সকল বিভাগীয় শহর, সিটি কর্পোরেশন, জেলা শহর, 'এ' এবং 'বি' গ্রেডভূক্ত পৌরসভার আবাসিক হিসেবে চিহ্নিত এলাকায় ঋণ প্রদান করা হবে।
- সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে একটি চমৎকার আবাসনের গর্বিত মালিক হোন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
ফোন: ০২-৯৫৫০৪৮৩, মোবাইল: ০১৭২৯-০৯০৭৯৫
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান বাণী

৫টি বিষয় অর্জন করা তরিকার মূল উদ্দেশ্য

- জমিয়ত অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন মনকে একমাত্র আল্লাহর চিন্তার দিকে নিয়োজিত করা।
- হুজুরী অর্থাৎ, আল্লাহকে হাজের (সর্বত্র বিরাজমান) নাজের (সর্বদর্শী) মনে করবার ক্ষমতা অর্জন করা।
- যজবাত অর্থাৎ, আল্লাহর দিকে মন প্রতি মুহূর্তে আকর্ষিত হওয়া।
- ওয়ারেদাত অর্থাৎ, আল্লাহর তরফ থেকে অসহ্যকর ফয়েজপ্রাপ্ত হওয়া।
- সালেক ও মুরিদের জন্য এই চারটি কাজ অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ
(১) নির্জনতা (২) নির্বাক অবস্থা (৩) ক্ষুধা সহ্য করা এবং (৪) অনিদ্রা অভ্যাস করা।

মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী

২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়
+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
+M Ambulance Service
ICU, CCU, NICU & PICU
www.ambulancem.com

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.